একটি জাতিকে হত্যা: বাঙালি নিধন পর্ব

আবদুর রউফ চৌধুরী

মা নেমেছেন, সন্তান বাঁচাতে।

৭০-এর শরতে বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছাসে ভোলা-হাতিয়া-সন্দ্বীপসহ যে বিপর্যয় এনেছিল পূর্ব-বঙ্গে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে বর্তমানে; এদেশ এখন মৃত্যু ও দুর্গতির সম্মুখীন। এবার কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়; মানুষ যে মানুষের প্রতি কত অমানসিক ব্যবহার করতে পারে তারই নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। পশ্চিম-পকিস্তান দ্বারা বাংলার ওপর চলছে হত্যাকাণ্ড। এটি আরও বেদনাদায়ক এজন্যে যে, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, যদি-বা যথাসময়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হত। শুরু থেকেই পাকিস্তান একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র, তবু বোধ হয় পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চলকে একত্রে ধরে রাখা সম্ভব হত; আর ৭০ মিলিয়ন বাঙালিকে শক্তির বলে দাবিয়ে রাখার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানি পাঞ্জাবি-নিয়ন্ত্রিত সামরিকবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন হত না, যদি সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব-বঙ্গের প্রতি খেয়াল রাখতেন, বাঙালির চাহিদা মেটানোর জন্য মনোযোগী হতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙালি নিরস্ত্র জনতার উপর সৈনবাহিনীর আক্রমণ সামরিক বর্বরতার ক্ষেত্রে সর্বকালের দৃষ্টান্তকে ম্লান করছে। পূর্ব-বাংলার সর্বস্তর মানুষের জীবনে ভীতিসঞ্চার করে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের প্রতি বাঙালির আনুগত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই বর্বরতা শুরু হয়েছে। এ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল ও আত্মঘাতী; বিরামহীন-বিরতীহীন আঘাত বা জোর চালিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না।

১৯৪৭ সালের আগস্টে, রক্তপিচ্ছিল পথ ধরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এলেও বঙ্গ নামের ভূখণ্ড বিভক্ত হয় পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে। পূর্ব-বঙ্গে থেকে যায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা, প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জেলা, চারটি থানা ছাড়া সিলেটও। এছাড়া নদীয়া, যশোর, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা অঞ্চলকে অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। এসব অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত পূর্ব-বঙ্গের মানুষ অনেক সম্ভব-অসম্ভবের আশা বুক বেঁধে জিন্নাহ যে উগ্রসাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র হাতে নিয়ে মুসলিম উৎপীরণের মিথ্যা অভিযোগে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন

তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টিলগ্ন থেকে একটি দ্বিধাবিভক্ত রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। এই দ্বিধাবিভক্ত রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত লাভ করার কারণ হচ্ছে– একদিকে যেমন এই নতুন রাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বাস করছে, ভৌগোলিক ব্যবধান প্রায় এক হাজার মাইল, তেমনি সংস্কৃতির দিক থেকেও হাজার হাজার মাইল দূরত্ব। পূর্ব-বঙ্গ ছাড়া পাকিস্তানের বাকি চারটি প্রদেশই পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত, ভৌগলিক সীমারেখার দিক থেকে একক; কিন্তু পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিম অঞ্চল থেকে হাজার মাইল দূরত্বেই শুধু অবস্থিত নয়, মাঝখানে ভারত রাষ্ট্রও; ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা– স্থল, জল, বিমান পথে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতির দিক থেকেও দ্বিধাবিভক্ত; করাণ– পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশ প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা, ভাষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীর গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য, জীবনপ্রণালী, ধ্যানধারণা, আচারাচরণ চৌদ্দ আনাই এক; কিন্তু বঙ্গের সঙ্গে পনেরো আনাই ভিন্ন; ধর্মীয় বিশ্বাসে শুধু এক সূত্রে গাঁথা। তদুপরি দু'অঞ্চলের মধ্যে দুস্তর আর্থিক ব্যবধানও বিদ্যমান। এগুলোকে অসহনীয় করে তুলেছে পূর্ব-বঙ্গের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রভুত্ব পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত ও ষড়যন্ত্র মূলক কতগুলো নীতিরীতি– রাজনৈতিক কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক শোষণ। পাট ও চা রপ্তানীর মাধ্যমে পূর্ব-বঙ্গ যা উপার্যন করছে এ পাকিস্তানের বাজেটের চাহিদায় ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা ৭৫ভাগ। পূর্ব-অঞ্চলের জনসংখ্যা যদিও বেশি তথাপি সামরিক ও বেসামরিক খাতে পাঁচভাগের চারভাগই ব্যয় করা হচ্ছে পশ্চিম-পাকিস্তানে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া হয় বছরের পর বছর, ঢাকনা শক্ত করে স্ক্রু-বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে বাঙালির অসন্তোষ বেরিয়ে আসতে না পারে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের ধারণা পরিত্যাগ করে ঝুঁকেছে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের দিকে। বাঙালি জীবন সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও শোষিত হতে শুরু করেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাঙালি রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২), স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন (১৯৫৪), জনসংখ্যাভিত্তিক আইন পরিষদ গঠনের দাবী (১৯৫৮-১৯৬০), অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবী (১৯৬০-১৯৬৫) ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন (১৯৬৮), গণ-অভ্যুত্থান (১৯৬৯) প্রকাশ করে এসেছে।

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বাঙালি সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে ১৯৫৪ সালে সংঘটিত প্রাদেশিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল আলাদা। নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ৩১০-সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে ২৩৭টি মুসলিম আসনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৫৩ যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল– আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রী দল এবং খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত নেতা ছিলেন– মওলানী ভাসানী, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী। ২১-দফার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নেমেছিল, আর তাদের ২১-দফার প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল– বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন করা, খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবর্তন ও শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রর্বতন করা, 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ আইনসহ সকল কালাকানুন বিলোপ করা, প্রশাসনিক ব্যয় সর্বাবিক ভাবে কমানো, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে প্রথমে একটি ছাত্রাবাসে এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠান রূপে গঠন করা, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা, ২১ ফেব্রুয়ারিতে যারা শহীদ হন তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান করা, সকল নিরাপত্তা ও নিরোধমূলক আইন বাতিল করা ও বিনা বিচারে আটক বন্দি মুক্তি দেওয়া, এবং সর্বোপরি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন আদায় করা; এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক

সম্পর্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রের অধীনে রেখে অন্যান্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনা এবং সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর সদরদপ্তর পূর্ব-বঙ্গে স্থাপনের ব্যবস্থা করা, আনসার বাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিলিসিয়াতে রূপান্তরিত করা এবং পূর্ব-বঙ্গে অস্ত্রনির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি। ২১-দফার বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, কারণ এই ইস্তাহার জনগণের দাবীদাওয়া ও আবেগানুভূতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সৃষ্টি করা হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগ কোনোরকম নির্বাচনী ওয়াদা ছাড়াই নির্বাচনে নেমে পড়েছিল, তাই ৩১০টি আসনের মধ্যে মাত্র ন'টিতে মুসলিম লীগ, ২২৩টিতে যুক্তফ্রন্ট, পাঁচটিতে অন্যান্য দল আর ৭৩টি ঐক্যফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল। ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল সংখ্যালঘুর জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলী ফেডারেশন ইত্যাদি দলের সমন্বয়ে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নানা দ্বিপাক্ষিক গোপন সমঝোতা গড়ে তুলে '৭০-এর ডিসেম্বর মাসে ইলেকশনের ডাক দেয়। ইলেকশনের মাধ্যমে যখন স্ক্রু একটু ঢিলা করা হয়, তখনই উঁকি দিয়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবী সম্বলিত ছয়দফার পক্ষে গণভোট হিসাবে শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ নির্বাচন অভিহিত করেন। দাবী তুলেন পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের– অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। জনসাধারণ একে পূর্ণ সমর্থন দেয়; জনগণ জানে এর ফলে পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোতে আঘাত পড়বে– পূর্ব-বঙ্গের উপর পশ্চিম-পাকিস্তানের সার্বিক আধিপত্য ও আর্থিক বরাদ্দলাভের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ অধিকার একেবারে ভেঙে যাবে। ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর '৭০ নিখিল পাকিস্তান জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন।

> The political programme of Sheikh Mujib's Awami League, overwhelminly endorsed by the people of East Pakistan in the recent elections, sought to correct these disparities by transferring control over economic policy from the Central Government to the Provinces. The response of Yahya Khan's Government was to unleash a resign of terror whose full dimension are only gradually becoming known.[1]

'৭০-এর ইলেকশনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-বঙ্গের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে, অন্য দুটি আসনে নুরুল আমিন ও রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন; তবে পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবিরা অনুমান করেছিলেন যে, কাইয়ূমের মুসলীমলীগ-৭০, দাওলতয়ানা-৪০, ভূট্টো-২৫, জাতীয় আওয়মীলীগ-৩৫ ও মুজিব আওয়ামী লীগ-৮০টি আসন পাবে। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপ-এর (ওয়ালী) একটি আসন ছাড়া সব আসনে আওয়ামী লীগ জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। পশ্চিম-পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পিপলস পার্টি, বেলুচিস্তান প্রদেশে ন্যাপ (ওয়ালী) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে ন্যাপ (ওয়ালী) ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (থানভী) কোয়ালিশন সরকার গঠনের মতো অবস্থা হয়। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; এতে পশ্চিম-পাকিস্তানের সার্বিক আধিপত্য ও সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ অধিকার– এই দুটি স্বার্থে আঘাত পড়ে। সামরিক ক্ষমতার বেসামরিক সরকার গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। গণতান্ত্রিক সুযোগকে ঠেকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষক ও শাষকগোষ্ঠী মিলিতভাবে সামরিকপন্থায় ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার পরিকল্পনা রচনা করতে উদ্যোগী হয়।

[1] The Sunday Times, 18 April '71.

> The military government, although it allowed elections, never indented to hand over real power to the people. Their calculation was that once election were held different parties would share the seats. There would be political chaos in the country and they would be able to discredit politicians once again to perpetuate their rule. But the election results shattered their plan. The promise to transfer power which Yahya Khan made soon after he came to power, as only a caretaker government, was a promise with a hidden meaning.[2]

নির্বাচনের পর পূর্ব-বঙ্গে সবকিছু বদলে যায়, যা ছিল অস্পষ্ট ইচ্ছা তা ধারণ করে সুস্পষ্ট এক ইচ্ছায়– ছয়দফার পরিবর্তনে একদফা– রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং জাতীর মুক্তি। বাঙালি বুঝতে পারে– নির্বাচনের রায়কে যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পূর্ব-বঙ্গে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তন করা হবে। দীর্ঘদিনের জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার এই তো সময়। বাঙালি প্রস্তুত। অন্যদিকে মাওলানা মওদুদী ও গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামি নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে বিবৃতি দেয়; আর পশ্চিম-পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো নির্বাচনে জয়ী শেখ মজিবুরের নীচে অবস্থান নিতে নারাজ প্রকাশ করে। গোপন জোট পাকাতে শুরু করে ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে; যদিও ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে ১১ জানুয়ারি '৭১ বিমানবন্দরে শেখ মুজিবুরকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে সম্বোধন করেছিল। আস্তে আস্তে শুরু হয় ভূট্টো-ইয়াহিয়া ও পাকিস্তানের ক্ষমতালিপ্সু সামরিক অফিসারের মিলিত ষড়যন্ত্র। ঠিক করে, তারা একজন বাঙালিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দেবেন না। কতগুলো রাজনৈতিক নাটকের মহড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়, শক্তি প্রয়োগে পূর্ব-বঙ্গকে ধরে রাখার। সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য শুধু সময়ের প্রয়োজন!

> ...from the election time, election results were in, Bhutto began trying to deny to the East the right to get the kind of constitution it wanted. Bhutto, a feudal landlord and former foreign minister with a brilliant but opportunistic career, had won in the West on socialistic promises to the poor. His obstructive manoeuvers against Rahman served the interests of the Western elite, however, rather than poor.[3]

সময় প্রয়োজন তাই সময় বের করে নিতে হবে, যেকোনো ভাবে। সময়ও এসে যায়– ভূট্টো যখন নতুন সংসদে অংশগ্রহণ নিতে অস্বীকার করে তখন ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সামরিক শাসক জানে ছয়দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করলে তাদের কোনো লাভ হবে না– এরকম আপোষরফা মানেই সামরিক শক্তির আত্মহত্যার নামান্তর। অন্যদিকে ছয়দফার সংশোধনে সম্মত না হলে পরিষদ অধিবেশনের কোনো সম্ভাবনা নেই; তাই ১লা মার্চ ইয়াহিয়া, ১টা পাঁচ মিনিটে, এক বেতার ঘোষণায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাব প্রকাশ করে। জাতীয় পরিষদ বৈঠক বাতিলের খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সারা পূর্ব-বঙ্গে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে, স্বতস্ফূর্ত গণবিস্ফোরণ। এ অপ্রত্যাশিত ঘোষণার প্রেক্ষিতেই শেখ মুজিবর রহমান হরতালের ডাক দেন। আওয়ামী লীগের অসামান্য পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে এই অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান পরিণত হয় অসহযোগ আন্দোলনে। পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ মানুষ দলে দলে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামের খেলার মাঠ থেকে গুলিস্তান, গুলিস্তান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত জনতার মিছিলে স্বাধীনতার আওয়াজ ধ্বনিপ্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বাঙালি জনতার মুখে একই শ্লোগান, 'বীর

[2] The Sunday Times, 18 April '71.
[3] The Evening Star [Washington], 8 July '71.

বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। স্বাধীনতার শ্লোগান দিয়ে বাঙালি জনতা বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলে, আর এখান থেকেই শুরু হয় পূর্ণ স্বাধীনতার যুদ্ধ, মুক্তির যুদ্ধ। ২রা মার্চ আবারও রাজধানীতে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। এই হরতাল পালনকালে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে, এতে দু'জন মৃত্যু বরণ করে ও বেশ কিছু লোক আহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসভায় গৃহীত হয় স্বাধীনতার প্রস্তাব। ছাত্ররা বাংলাদেশের একটি মানচিত্র আঁকা পতাকা বহন করে শুভযাত্রা করে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত একটানা ১২-ঘন্টার কার্ফু জারি করা হয়। ৩রা মার্চে পানি, প্রেস, বিদ্যুৎ হরতালের বাইরে রেখে অফিস-আদালত বন্ধের নির্দেশ আসে আওয়ামী লীগ থেকে। টাকা লেনদেনের জন্য ব্যাংকগুলো শুধু খোলা রাখা হয়, আড়াইটা থেকে চারটা পর্যন্ত। বিকালে, পল্টন ময়দানে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষিত হয়। ৫৬ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম– বাংলাদেশ, জাতীয় সঙ্গীত– আমার সোনার বাংলা, আর দেশের সর্বাধিনায়ক– শেখ মুজিবর রহমান।

৪ঠা মার্চ বিভিন্ন স্থানে বাঙালি ও অবাঙালির মাঝে শুরু হয় দাঙ্গা। এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয় যে, ঢাকায় আটজন বিদ্রোহীকে হত্যা করেছে পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যরা এবং চট্টগ্রামে বাঙালি আর অবাঙালির মধ্যকার সংর্ঘষের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। নিষ্ঠুর পাকিস্তানি সৈন্যরা টঙ্গীতে দু'ব্যক্তিকে হত্যা করে। বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। হরতাল, সংগ্রাম, গুলি আর মানুষ মারার খেলা। মুক্তি সংগ্রাম। শুরু হয় অঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন; এই আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ'-এর সমগ্র প্রশাসন বিভাগ কার্যত– এক 'বিকল্প সরকার'-এ পরিণত হয়। বাংলাদেশের মধ্যে দুটি আইন– একটি মার্শাল'ল রেগুলেশন আর অপরটি আওয়ামী লীগ রেগুলেশন। সত্যিকার অর্থে দেশ চলছে আওয়ামী লীগের নির্ধারীত আইন অনুযায়ী; কাজেই ইয়াহিয়ার উচিত শেখ মুজিবরের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় ফিরে আসা, অন্যথায় পূর্বাঞ্চল চলে যাবে আপন পথে; তবুও কি হুঁশ হচ্ছে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো মদ্যপায়ীদের। আসলে কিন্তু আকস্মিক ঘটনা মোটেই না– এ একটি পূর্ব-পরিকল্পিত ঘটনা। সামরিক জান্তা চাচ্ছে বাঙালিকে চূড়ান্ত আঘাতে হত্যা করতে। সমর প্রস্তুতি। সুপরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে হত্যা করা ছাড়া এ অন্য কিছু না।

> ...the bits and pieces that have come to light make it clear that the power establishment in the West never intended to let Sheikh Mujib win a single measure of autonomy for East Pakistan.[4]

'৭১-এর পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য না, বরং অবশিষ্ট আয়োজন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের সঙ্গে শান্তির আলোচনার প্রস্তাব দেয়। শন্তির আড়ালে অশান্তির জাল বিস্তার করাই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য। ৬ই মার্চ, জাতীয় রেডিও-র মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করে যে, জাতীয় পরিষদের বৈঠক আগামী ২৫শে মার্চ শুরু হবে। হুমকির সুরে আরও বলে, 'আমি সেনাবাহিনীর প্রধান থাকা অবস্থায় পাকিস্তানের সংহতি, ঐক্য ও নিরাপত্তা নষ্ট হতে দেব না।' একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লে. জেনারেল টিক্কা খানাকে নিয়োগ করে পূর্ব-পাকিস্তানের গভার্ণর হিসাবে; এ থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, ইয়াহিয়া শক্তির বলে শাসন করতে চাচ্ছে। এ বুঝতে পেরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান লাখ মানুষের সমাবেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আর এ উদ্যোগকে সরকারীভাবে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্তে সামরিক সরকার ঢাকায় নিয়ে আসে টিক্কা খানকে বিকেল ৩.৪০ মিনিটে। শোসকগোষ্ঠী সামরিক শক্তি

[4] The New York Times, 28 March '71.

প্রয়োগের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চের ঘোষণায় বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বিশাল গণসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে শেখ মুজিবর রহমানের ঘোষণা হয়ে ওঠে বাঙালির কাছে এক অভ্রান্ত পথনির্দেশ। ৮ই মার্চ সকালে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণটি রেডিও-পাকিস্তান-ঢাকা থেকে পূণঃপ্রচার করা হয়। একই সঙ্গে 'রেডিও পাকিস্তান' ও 'পাকিস্তান টেলিভিশন'-এর নাম বদলিয়ে 'ঢাকা বেতার' ও 'ঢাকা টেলিভিশন' নামে প্রচার শুরু করে। লন্ডনেও দশ হাজার বাঙালির সমাবেশে 'বাংলাদেশ'-এর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর জয়ধ্বনি ওঠে। স্বাধীনতার ডাক ছড়িয়ে পড়ে দেশে প্রবাসে বাঙালির মাধ্যমে; বাঙালি চায় এমন একটি দেশ, যেখানে থাকবে না আর– অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও শোষণের অভিশাপ– অসুন্দরের অবসান ঘটিয়ে সমৃদ্ধ ও সুন্দর একটি সমাজতান্ত্রিক ও শোষনহীন দেশ কামনা করছে। বাংলাকে আর কোনো শক্তিই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারবে না। পশ্চিম-পাকিস্তানে জামাইত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতি মাহমুদ যাই ঘোষণা করেন না কেন, বাংলার মাটি-পানি-আলো-বাতাসে লালিত-পালিত মানুষগুলোকে ঠেকানো যাবে না। দেশের বিভিন্ন শহরে অস্ত্রবিক্রির দোকান ও থানা থেকে স্বাধীনতাকামী মানুষ অস্ত্রসংগ্রহ করতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে 'ডামি' রাইফেল হাতে নিয়ে সামরিক কুচকাওয়াজের কর্মসূচী শুরু হয়। দেশে শোকের ও বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে কালো পতাকার পাশাপাশি স্বাধীনতার পতাকাও উড়তে থাকে।

একটি যুদ্ধের আহ্বান মনেই দেশের ধ্বংস হবে, সহস্র সন্তান হবে পিতৃহারা, স্ত্রী হবে স্বামীহারা, পিতা-মাতা হবে সন্তানহারা, সহস্র পরিবারের দীপ নিভে যাবে; কিন্তু বাঙালি জানে, ক্ষমতালোভী যুদ্ধোন্মাদ পাষাণের কাছে মানবিক মূল্যবোধের আশা করা বাতুলতা মাত্র। পাষাণের পশুশক্তিকে পূর্ব-বঙ্গ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে বাঙালিকে জেগে উঠতে হবে। সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাত কোটি বাঙালির হয়ে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ৯ই মার্চ, পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেন স্বৈরাচারী ইয়াহিয়াকে। তিনি আরও বলেন, 'পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন হইবে পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে না, অখণ্ড রাখিব না। ...তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কর এবং আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করব।' বঙ্গবন্ধুর ডাকেও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পূর্ব-বঙ্গের নতুন গভার্ণর জেনারেল টিক্কাকে শপথ করাতে অস্বীকৃতি জানান। টিক্কা শপথ নিতে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের সচেতন মানুষও বুঝতে পারে পূর্ব-বঙ্গকে স্বাধীনতা না দেওয়া পর্যন্ত বাঙালি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের জননেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান, ১০ই মার্চ, ঢাকা সফর শেষে করাচিতে ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কোথাও তিনি পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখেননি। পূর্ব-বঙ্গের কার্যত সরকার হচ্ছে আওয়ামী লীগ। ঢাকার সকল সংবাদপত্র, ১৪ই মার্চ, একযোগে 'আর সময় নেই' শীর্ষক একটি যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে– এতে বলা হয় অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত।

...while he [Yahya] negotiated with Mujib, his General planned carnage.[5]

১৯৬৫ সালে বেলুচিস্তানে স্থানীয় একটি গোত্রের বিদ্রোহ দমন করতে নিষ্ঠুর টিক্কা পাকিস্তান বিমানবাহিনী ও গোলান্দাজবাহিনী ব্যবহার করে নির্বিচারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বেলুচি বাড়িঘর, ধ্বংস করেছিল জানমাল। পাকিস্তান বাহিনী জানিয়ে দিয়েছিল যে, বিদ্রোহের পরিণতি– পরিবার পরিজনসহ নিশ্চিত মৃত্যু। সে থেকে বেলুচিস্তানীরা বোমরু হিসাবে পরিচিত। এই সে নিষ্ঠুর টিক্কা খান। সে প্ররোচিত করে প্রেসিডেন্টকে– পূর্ব-বঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সামরিক সমাবেশের একান্ত

[5] The Guardian, 31 March '71.

প্রয়োজন। সামরিক জান্তার ক্ষমতালোভী উন্মাদরা সৈন্য ও অস্ত্র আনতে থাকে পাকিস্তান থেকে বাংলায়।[6] কিন্তু প্রয়োজন মেটানোর জন্য আরও সময়ের দরকার, তাই শান্তি আলোচনার প্রস্তাব ইয়াহিয়া দেয়। ইয়াহিয়া ১৫ই মার্চ ঢাকায় এসে, ১৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট হাউসে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে এক রাজনৈতিক বৈঠকে বসে, আড়াই ঘন্টা ব্যাপক চলে, বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া 'তার' যোগে ভুট্টোকে ১৯শে মার্চ ঢাকা আসার আমন্ত্রণ জানায়। ১৭-১৮ই মার্চ ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, প্রথম দিন এক ঘন্টা ও দ্বিতীয় দিন দেড় ঘন্টা; কিন্তু কোনো সমাধানে সরকার পৌঁছাতে পারেনি। অন্যাদিকে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র এ্যাকশন কমেটি দাবী করে ইয়াহিয়া যেন অতিস্ত্বর পাকিস্তানি সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনে; কিন্তু ইয়াহিয়া শুনেনি। তাই ১৯শে মার্চ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম মোকাবেলা শুরু হয়। সশস্ত্র লড়াই। বাঙালি জনতা বনাম পাকিস্তানি সৈন্য। ঢাকার রাস্তায় হাজার বাঙালির সমারহ। ব্যারিকেড দিয়ে পাকিস্তানি সৈনিকের গাড়ির যাতায়তের বাঁধা সৃষ্টি। সরকার কারফিউ ডাকে। জনতার পক্ষে প্রচুর হতাহাত হলেও জনতা ও সৈন্যের মধ্যে গুলি বিনিময় বন্ধ করা যায়নি। ইয়াহিয়া বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসে। ২০ই মার্চও দু'ঘন্টা দশ মিনিটের বৈঠক হয় ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবর রহমানের। জুলফিকার আলী ভুট্টো পনের সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দলসহ পশ্চিম-পাকিস্তান ত্যাগ করে ২১ই মার্চ ঢাকায় দেড় ঘন্টার রাজনৈতিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ২৩শে মার্চও মুজিবর-ইয়াহিয়া-ভূট্টোর বৈঠক বসে। বিশ্ববাসী একটি আপোষ ফর্মূলার অপেক্ষায়।

> ...it is clear now that the West Pakistanis never meant the talks to succeed, that they dragged them out only to buy the time to get enough troops reinforcements over from West Pakistan to launch the attack.[7]

বিশ্ববাসীর চোখে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে টিক্কা পাকসেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে ওঠে। সিংহলপথে পি.আই.এ'র কমার্শিয়াল ফ্লাইটে, শাদা পোশাকের ছদ্মবেশে, সশস্ত্রবাহিনীর লোক বাংলাদেশে আসতে থাকে। সি-১৩০ পরিবহণ বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র ও রসদ আসে, সৈন্যসংখ্যাও দ্বিগুণ করে ষাট হাজারে উন্নীত হয়।

> ...troops were flowing in daily from West Pakistan and many Bengali began to believe that the negotiations were being deliberately prolonged to give the Government in West Pakistan time to get heavy reinforcements to the East.[8]

২৩ই মার্চ পাকিস্তান দিবসে বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে ৩২নং ধানমণ্ডিতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন; দেশের সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। দিনের প্রথম প্রহরেই বাংলার সংগ্রামী জনতা রাজধানীর পথে বেরিয়ে পড়ে, 'আমার সোনার বাংলা'র মাধ্যমে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে; ঢাকা টেলিভিশনও 'আমার সোনার বাংলা' প্রচার করে। ছাত্রলীগের 'জয় বাংলা বাহিনী' আনুষ্ঠানিকভাবে কুচকাওয়াজ করে বঙ্গবন্ধুকে সালাম জানায়। ২৪ই মার্চ সারাদিন দেশের অবস্থা থমথমে, বাঙালি এক অজানা সংগ্রামে মত্ত। সারাদেশেই আসন্ন মহামুক্তিসংগ্রামের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহর, সাতক্ষীরা, খুলনা, দিনাজপুর, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় মানুষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শহর-গ্রাম-বন্দর-গঞ্জে প্রস্তুতি নেয়। আবারও মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু ফল কিছুই মেলে না। বাঙালি জানে জাতি আজ

---

[6] The Baltimore Sun, 30 March '71. [...they [Pakistan Army] flew in more troops from West Pakistan.]
[7] The New York Times, 4 April '71.
[8] The New Times, 28 March '71.

মহাসংকটে নিপাতিত, একটি বিরাট সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই; তাই চট্টগ্রাম বন্দরে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে 'এম.ভি. সোয়াত' জাহাজযোগে নিয়ে আসা অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে বাঙালি শ্রমিকরা অস্বীকৃতি জানায়, ক্ষিপ্ত পাকবাহিনীর সৈন্য এদের ওপর গুলি চালালে অনেকেই হতাহত হয়।

> ...people asleep in the Bazaar were shot. In the morning the victims were still lying there with rugs on them as if they were still sleeping.[9]

২৫শে মার্চ মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংসতম গণহত্যার দিন। এ রাতে মুজিবর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে না-বসে, 'সর্ব প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন'– টিক্কা খানের সঙ্কেতে আশ্বস্ত ইয়াহিয়া চিন্তিত ভুট্টোর হাত ধরে আপোষ অলোচনার ছদ্ম-আবরণ খুলে পি.আই.এ প্লেন যোগে ঢাকা ত্যাগ করে, নির্মমভাবে আঘাতের চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাওয়ার আগে তার বর্বর সৈন্যকে বাঙালির বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচার করার নিদের্শ দিয়ে যায়। শুরু হয় টিক্কার সমর অভিযান। ২৫শে মার্চ রাতের আঁধারে ঢাকার ঘুমন্ত পরিশ্রান্ত মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী পাঁচ ডিভিশন আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈনিক মর্টার-মেশিনগান-ট্যাংকসহ বিভিন্ন মারাত্মক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। টিক্কার নেতৃত্বে এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা ঘটে। একই সঙ্গে পঞ্চাশটি শহর ও দু'হাজার গ্রামে মার্শাল 'ল জারি করা হয়। ছাত্রাবাস, প্রফেসার কোয়াটার্স, পুলিশ ফাঁড়ি, বাজার ও আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে পাইকারীভাবে বাঙালি হত্যা করতে শুরু করে। অসংখ্য বাড়িঘর জ্বালিয়েপুড়িয়ে উজাড় করতে থাকে পাষাণরা। এক কথায়, যেভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে এ শুধু পাকিস্তানি বর্বর ছাড়া আর কোনো মানুষ করতে সক্ষম না। শেখ মুজিবর রহমানকে, ২৫শে মার্চের গভীর রাতের এ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক করা হয়। নিজ বাসভবনে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বলেন, '...from today Bangladesh is independent.' তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তানির শেষ সৈনিকটির পরাজয়ের আগ পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলবেই।' ঢাকার রাজারবাগ ও পীলখানায়, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সৈনিকবাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা যথাক্রমে বাঙালি পুলিশ, ইপিআর ও 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট'-এর সদস্যকে হত্যা করতে থাকে।

> ...the Army seized control of Dacca on Thursday night and gunfire including heavy artillery was heard till late on Friday morning. Huge fires burnt in the direction of Dacca University.[10]

আকস্মিক বর্বরোচিত আক্রমণের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। টিকিহীন টিক্কার হুকম তামিল করে চলে পাষণা সৈন্যরা, উত্তপ্ত জিঘাংসার সঙ্গে। পূর্ব-বঙ্গের রাজধানী ঢাকার রাস্তায় সাঁজোয়া বহর ট্যাংকগুলো ধ্বংস করে চলে সামনে পিঁছে যা কিছু পায় সব– মানব বা দালান নির্বিচারে। অনুষ্ণশোণিত-নিংস্রতায় পাঞ্জাবি পয়মাল সৈনিক মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকে হত্যা করে চলে। কারও নিস্তার নেই, একের পর এক লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। বর্বরা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে বাঙালির ঘরবাড়িতে, দামী দালান হোক আর বস্তির খুপড়িই হোক– কোনো ভেদাভেদ নেই, সারা শহর যেন রাবনের লঙ্কাপুরী। পাকবাহিনীর এই হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট আর অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিলেতের মানুষ স্তব্ধ। বাংলাদেশ একটি নিথর গোরোস্তানে পরিণত হয়েছে।

[9] The Daily Telegraph, 30 March '71.
[10] The Washington Star, 1971.

> 200 Students were killed in Iqbal Hall when their rooms were sprayed with Machinegun fire ... the military removed many of the bodies but the 30 bodies still there could never accounted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall.[11]

২৫শে মার্চের মাঝরাতে আমেরিকার দেওয়া এম-২৪ ট্যাঙ্ক নিয়ে পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে। দুস্যরা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি দখল করে এবং তাকে প্রধান ঘাঁটি বানিয়ে ছাত্রাবাসগুলোতে গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। ইকবাল হলে অবিরাম গুলি নিক্ষেপে ২০০জন ছাত্র নিহত হয়।

> President Yahya Khan's tanks have been ordered into destructive action, no holds barred against the people of East Pakistan; and in grim logic the enemy must be the whole people because they had declared this with rare unanimity for demands of self-rule.[12]

২৬শে মার্চ শুরু হয়– চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, যশোহর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর, বরিশালসহ প্রভৃতি শহরে পাকিস্তানি বর্বরদের নির্বিচার গুলি ছোঁড়ার খেলা। ওরা গুলি চালিয়ে অসংখ্য নিরপরাধ, নিরস্ত্র ও অসহায় জনগণকে হত্যা করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– পাকিস্তানি বর্বরবাহিনী মধুপুরগড়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বাঙালি ইপিআর, পুলিশ ও সাধারণ জনতার প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙে ঢাকা থেকে অগ্রসর হয় জামালপুর দখল করার উদ্দেশ্যে। দেওয়ানগঞ্জ থানা শহরেও অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করে চিনিকলের বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারীকে হত্যা করেছে। অগণিত ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই। এই বর্বরবাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য যে, যে-কোন নির্মমতার বিনিময়ে বাঙালির স্বাধীনতা স্পৃহাকে স্তব্ধ করা এবং নির্যাতন ও ধ্বংস করে স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে হত্যা করা।

> ...on the morning of March 26 ... they [Pakistan Army] went about systematically destroying the entire old city of Dacca. The Army shot every person in the old city and burnt inside their homes. The biggest massacre was in Hindu locality. The Army then rushed to its next target, the Centre of Sheikh Mujib's supporters. The carnage continued till the night.[13]

২৬শে মার্চ সারা দেশে টেলিগ্রাফ যোগে বঙ্গবন্ধুর বার্তা প্রচার করা হয়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে বিদ্রোহী বাঙালি কর্মচারীরা দখল করে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি দুপুর ২.১৫ মিনিটে এম.এ.হান্নানের কণ্ঠে প্রচার করা হয়; পরের অধিবেশনে সামরিক বিধিনিষেধ প্রচার হতেই চট্টগ্রাম বেতারকর্মীরা রেডিও-প্রচার বন্ধ করে আগ্রাবাদস্থ বেতার ভবনকে সম্পূর্ণ অকেজো করে বেরিয়ে পড়ে। রাতে হানাদারবাহিনীরা পুরাতন ঢাকা অঞ্চলকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে ওঠেপরে লেগে যায়। অন্যদিকে পাকিস্তান বিমানবাহিনী আক্রমণের হাতিয়ার জঙ্গী বিমান দিয়ে আক্রমণ করে কর্নেল রবের গ্রামটিকে। বিমানগুলো কয়েকবার হবিগঞ্জের হলদারপুরের আকাশে চক্কর দিয়ে বোমা ফেলতে শুরু

[11] The Daily Telegraph, 30 March '71.
[12] The New Statesman, 2 April '71.
[13] The Daily Telegraph, 30 March '71.

করে। দেখতে দেখতে এ গ্রামটি একাত্তুরের হিরোসিমায় পরিণত হয়। পাকসেনাবাহিনীর নির্মম ও সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে ৭২-ঘণ্টা অতিবাহিত হতে থাকে।

২৫/২৬ মার্চের রক্ত ঝড়ানো ঘটনার পর কত দিন অতিবাহিত হচ্ছে, তবুও কি হত্যাকাণ্ড থামছে? সমানে সমানে চলছে বাঙালি নিধন পর্ব। ঢাকাতে এ আর সীমাবদ্ধ না, সারা দেশ জুড়ে একই অবস্থা– চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, যশোহর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর, বরিশাল প্রভৃতি শহরে পাকিস্তানি বর্বরদল নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছে অত্যাচার, হত্যাযজ্ঞ– নিরপরাধী, নিরস্ত্র ও অসহায় বাঙালি হত্যা।

যতদিন যাচ্ছে হত্যাযজ্ঞের তীব্রতা বাড়লেও, পাঞ্জাবি সেনার নিষ্ঠুরতার কমতি না-হলেও ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কার অবর্ণনীয় আক্রমণের ভয়াবহতার আতঙ্কে বাঙালির চোখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অস্তিত্বের অবশিষ্ট যুক্তিটুকু নদী-ভাঙা জলের মতো বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে। সারা দেশ এক চরম মুহূর্ত উপস্থিত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে নিরস্ত্র-নিরীহ-শান্তিপ্রিয় বাঙালির ওপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়া, বর্বর হামলা, সভ্য পৃথিবীতে আর হয়েছে বলে মনে হয় না। নরনারী নির্বিশেষে সমগ্র সাড়ে সাত কোটি মানুষ দস্যুর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের এমন কোনো শহর বা গ্রাম নেই যেখানে এই বিদেশী বর্বর নির্বিচারী শত্রুর হাত থেকে বাঙালি গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, দেশের সম্পদ বিনষ্ট এবং লুটপাত ও নারী নির্যাতন থেকে মুক্তি পাচ্ছে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর সমস্ত বাঙালি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে চরমভাবে নিপীড়িত হয়ে এসেছে। এই সর্বপ্রথম জাতীয় মুক্তির আশা দেখতে পেয়ে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবি সবাই রক্তঝরা সংগ্রামের পথে নেমে পড়েছে। ১৯৭১-এ শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্রহামলা বাঙালির আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করতে পারছে না, বরং শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। বাঙালি যেভাবে পারছে সেভাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি আর অসংখ্য তরুণ-তরুণী পাকিস্তানি বর্বরদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের জনগণ নির্মম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এ জ্ঞানলাভ করছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষের পথে বাংলাদেশের মুক্তি আসা সম্ভব না, বাংলাদেশকে তথা বাংলাকে বাঁচাতে হলে দস্যুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়া করতেই হবে। সারা বাংলায় বিদ্রোহের আগুন। প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতা– সাধারণ বাঙালি। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি আজ একতাবদ্ধ।

জয় বাংলাদেশ। মুক্ত বাংলাদেশ।

মূল খসড়া: ১৯৭১। লণ্ডন।